দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

083

পরীক্ষায় এত ফেল

উননব্বই সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাসের কম হার একটি বড় ভাবনার ব্যাপার। যেসব পরীক্ষার্থী ফেল করেছে, তারা তো মর্মাহতই আশাহত হয়েছেন তাদের অভিভাবকরাও। তবে বেশি ভাবিত সমগ্র সমাজ। এই অঘটন ঘটল কিভাবে? এর পেছনের আসল কারণটা কি? এইসব প্রশ্নে তোল পাড় সবার মন। সবাই উদ্বিগ্ন। সবাই চিন্তিত।

এই উদ্বেগ ও চিন্তা অকারণ নয়। এবার ৪টি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৩,১৫,৮৮৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসের গড় হার ২৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ শতে পঁচাত্তর জনেরও বেশি ফেল। ফেলের হার গত তিন বছরের হারের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৮৮, ১৯৮৭ ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে ৫৬ দশমিক ৭৯, ৫২ দশমিক ৫৩ এবং ৪২ দশমিক ৭৯ শতাংশ ফেল করেছিল। এর আগে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত পাসের হার অনেক বেশি ছিল। এক বছরে এমন কি ঘটে গেল যে, এবার চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষার পুলসেরাত পার হতে পারল না?

কেবল ছাত্র-ছাত্রীই নয়, সমাজ জীবনেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই দুই পরীক্ষায় পাসের অর্থ উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করার এবং চাকরি পাওয়ার সুযোগ উন্মোচিত হওয়া। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে জ্ঞানার্জন, মেধার বিকাশ এবং সংস্কৃতিবান ও পরিশীলিত মনের অধিকারী হওয়া—একথা সমাজ আজ ভুলে গেছে। শিক্ষার অর্থকরী দিকটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ফল হতাশাজনক হওয়ার কারণ হিসেবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলছেন। কেউ বলছেন নকল রোধের কঠোর ব্যবস্থা ও পরীক্ষার খাতা দেখায় অতি কড়াকড়ির কারণেই এটা ঘটেছে। কেউ বলছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অমনোযোগের কথা। কেউ দিচ্ছেন শিক্ষা নিকেতনে নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা না চলার দোষ। কারও তর্জনী শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়াবার প্রবণতার দিকে। শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদের কথাও কেউ কেউ তুলছেন।

একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, কোন কারণ একক ভাবে নয়, বরং সবগুলি সম্মিলিতভাবে দায়ী পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক ব্যর্থতার জন্যে। এসব কারণে শিক্ষার মূলদেশ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেয়েছে, অবশেষে নেমেছে বিরাট ধস। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছু আছে কিনা দেশে এই প্রশ্নই আজ জাগছে অনেকের মনে।

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন চালু রাখার স্বার্থে ম্যাকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু কিছু বিবর্তন ঘটলেও তার কাঠামোগত তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মুখস্থ বিদ্যাভিত্তিক এই শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরি সংগ্রহ।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষায় পাসের হার বৃটিশ যুগ বা তার পরবর্তীকালে—কখনই খুব বেশি ছিল না। তবে তখন বিদ্যানিকেতনে শিক্ষা-শিক্ষণ যথানিয়মে চলত, পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। ক্রমে ক্রমে এর পরিবর্তন ঘটে। পচন ধরা শুরু হয় ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে। সত্তরের দশকে সর্বাঙ্গে দগ দগে ঘায়ের আকারে দেখা দেয়। একাত্তর সাল ছিল মুক্তিযুদ্ধের বছর। লেখাপড়া, পরীক্ষা—কোনটাই যথানিয়মে চলার প্রশ্ন ওঠে না। ছেলে-মেয়েদের এই অসুবিধার কথা ভেবে বারোর সালের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় কড়াকড়ি শিথিল করা হয়। ফলে নকলের হিড়িক পড়ে। পাসের হার শতকরা সত্তর-আশি ভাগে ওঠে। অনেকে সখেদে বলতেন, টুলটেবিলও তো পাস হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁস টোকাটুকি, বই দেখে লেখা, বাহির থেকে উত্তর বলে দেয়া, সিক বেড়ে পরীক্ষা, খাতা বদল, পরিদর্শকবিহীন হলে পরীক্ষা দেয়া, কড়া পরিদর্শককে নাজেহাল করা, জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেটের কারবার ইত্যাদিতে পরীক্ষা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কারণে বেশিরভাগ শিক্ষকও শিক্ষাব্রতীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন। তারা বেশি মন ও সময় দেন প্রাইভেট টুইশনিতে। তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন ফাঁস করেন, এমনকি খাতার নম্বরেও হেরফের ঘটান বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত দেড় দুই দশকে দেশে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সারা বছর এগুলিতে লেখাপড়া বলতে কিছু হয় না। কিন্তু পরীক্ষার সময় ছাত্রের ভীষণ ভিড়। কোন কোন স্কুল-কলেজ টাকার চুক্তিতে পরীক্ষার্থীদের পাস হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। পরীক্ষায় নকল বৃদ্ধি পাসের কম হার, শিক্ষামানের অবনতি ইত্যাদির জন্য এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান কম নয়।

বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সুস্থ ও সুষ্ঠু করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। নকল রোধের চেষ্টা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, এবারের এইচএসসিতে পাসের নিম্নহারের এটা একটা বড় কারণ। এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

পরীক্ষায় ব্যাপক ব্যর্থতা কেবল পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্যই নয় জাতির জন্যও বিরাট ক্ষতি। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য। মানুষের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ, জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, জন বিস্ফোরণ ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার অন্য কোন বিকল্প নেই। এছাড়া টাকার নিরিখেও পরীক্ষা ফেলের ক্ষতি বিরাট। প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতার ফলে সরকার ও অভিভাবকদের প্রায় শত কোটি টাকা গচ্চা যায় বলে এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উপর রয়েছে মানব শক্তির ক্ষতি। পরীক্ষায় যারা ফেল করে, তাদের একটা বড় অংশ হতাশ হয়, আত্মবিশ্বাস হারায়। এতে অনেকের মেধা ও কর্মশক্তির বিকাশ অবরুদ্ধ হয় চিরতরে।

জাতীয় উন্নতি ও নাগরিকদের কল্যাণের স্বার্থে শিক্ষার বিস্তার এবং পরীক্ষায় ব্যাপক ব্যর্থতা রোধ একান্ত জরুরী। এ জন্য সমগ্র শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশ এবং আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার সহায়ক হয়।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার দরকার। অবজেক্টিভ প্রশ্ন হলে ছাত্র-ছাত্রীরা গোটা পাঠ্য বিষয় পড়তে বাধ্য হবে, তাদের মুখস্থ প্রবণতা দূর হবে। স্কুল পর্যায়ে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে শুধু মেধার ভিত্তিতে, শ্রেণীর রেকর্ড অনুসারে পাসের ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

—সমদর্শী